তারিখ ... 1 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫

সংবাদ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার একাল-সেকাল

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

প্রাথমিক শিক্ষা একটি দেশের ভিত মজবুত করে। তাই এই শিক্ষাটিকে অতি সহজ লভ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাদান করা উচিত। ব্রিটিশ আমলের আগে ও পরে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ছিল খুবই করুণ। তখন এ শিক্ষাটি জমিদার, ভূস্বামী, সমাজ দরদি, শিক্ষানুরাগী বরেণ্য ব্যক্তিদের প্রেরণা অনুদান ও অর্থানুকূল্যে জমিদারদের বারান্দায় কাচারীঘরে, গুরুগৃহে, মক্তবে, মাদ্রাসায় টোল, মঠ, মন্দির, গাছতলা বটতলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হতো। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত হয়েছে নিচু এলাকা এবং হাওর অঞ্চল ব্যতিত বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। এক কালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক বা এসএসসি পাস শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হতো এখন সেই জায়গা অর্নাস মাস্টার্স পাস শিক্ষক শিক্ষকতা করছে। যে শিক্ষাটি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট অতি সহজ হবে এবং শিক্ষার্থীরা খুশি এবং আগ্রহ মনে গ্রহণ করতে পারবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি তাহাই হবে প্রকৃত প্রাথমিক শিক্ষা। আমাদের বাংলাদেশকে শুধু শহর অঞ্চল দিয়ে মূল্যায়ন করলে হবে না। ১,৪৭,৫৭০, বর্গকিমি নিয়ে বাংলাদেশকে চিন্তা করতে হবে। দেশ স্বাধীনের পরে আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েছি।

আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে আমি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাই আমার শ্রদ্ধাভাজন আব্বা বাজার থেকে আমার জন্য একটি সবুজ সাথী বই, মাটির চারপাশে কাঠ লাগানো ব্লাক বোর্ড পেন্সিল এবং চক এনে দিয়েছিল। বাড়িতে আমরা এই গুলি দিয়ে বড় ভাই আব্বা আম্মা অথবা টিউটরের নিকট লেখা শিখেছি। তারপর যখন প্রথম প্রথম বিদ্যালয়ে গিয়েছি তখন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকগণ আমাদের ক্লাসের সকলকে তিনটি দলে ভাগ করে দিয়েছিল। প্রথম ভাগের নাম প্রথম শ্রেণী 'ক' শাখা, দ্বিতীয় ভাগের নাম প্রথম শ্রেণী 'খ' শাখা এবং তৃতীয় ভাগের নাম প্রথম শ্রেণী 'গ' শাখা। যারা আমরা স্বরবর্ণ ব্যাঞ্জনবর্ণ লিখতে এবং পড়তে পারতাম তারা প্রথম শ্রেণী 'ক' শাখায় পড়তাম। যারা কিছু কিছু লিখতে পারতো তারা প্রথম শ্রেণী 'খ' শাখা এবং যারা কিছুই পারত না তারা প্রথম শ্রেণী 'গ' শাখা পড়তো। এভাবে অতি সহজ ভাবে আমাদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়য়ে শিক্ষক মহোদয়গণ পড়িয়েছেন। কখন যে আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয় পাস করে হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছি আমাদের পিতা মাতা তা ভালোভাবে উপলব্ধিও করতে পারে নাই। এখন কার ছেলে, মেয়েরা যেভাবে স্কুলে যায় এবং লেখা পড়া করে তাদেরকে আগে থেকে গৃহশিক্ষক বা নিজে ভালোভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে ভর্তি করাই। স্কুলের শিক্ষকগণ শুধু, দায়িত্ব পালন করে আগেকার দিনের শিক্ষকদের মতো হাতে কলমে শিখিয়ে তোলা দায়িত্ব মনে করে না। তবে বাংলাদেশের সব স্কুলে একই রকম অবস্থা বিদ্যমান নয়।

কোন, কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের একেবারে মূল থেকে তুলে শিক্ষা দিয়ে থাকে। আমি যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়েছি তখন আমার কিছু, কিছু মনে আছে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ আমাদেরকে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ লিখা শিখিয়েছে। এখন শহর বন্দরে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন এমনকি হাইস্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক শাখার শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি বর্ণমালা গুলি লিখা এবং পড়া শিখায় কিনা সন্দেহ আছে। শহরের এমনকি ভালো ভালো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের এক বছর আগে থেকে অগ্রিমভাবে পড়িয়ে ভর্তি করানোর জন্য ভর্তি যুদ্ধে নামতে হয়। যদি ও সরকারি ভাবে এখন প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা নিষিদ্ধ রয়েছে। বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমাদের সময়ে এমনকি আশি এবং নব্বই এর দশকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণী থেকে ইংরেজি বাধ্যতামূলক ছিল। আমরা যখন প্রথম শ্রেণী পাস করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছি তখন আমাদের ইংরেজি বর্ণমালা পড়া, লিখা এবং উচ্চরণ শিখিয়েছে। ৩য় শ্রেণী থেকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজি পড়া লিখা শিখা এবং পরীক্ষা দিয়েছি।

আমাদের সময়ে আরেকটি প্রধান সমস্যা ছিল পাঠ্য বই। তখন এখন কার মতো বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হতো না। ছাত্রছাত্রীদের বাজার থেকে বা লাইব্রেরি থেকে বই কিনে পড়তে হতো। তখন বই কেনা সবার জন্য সহজ ছিল না। গ্রামের ধনীক শ্রেণীর লোকের ছেলে মেয়েরা বছরের প্রথমে নতুন বই কিনতে পড়তে পারতো। আর অন্য ছেলে মেয়েরা পুরাতন বছরের বই কিনে পড়ত। এখন কার মতো যদি দেশ স্বাধীনের পর বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করত এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি পালন করত তবে বাংলাদেশ শিক্ষার হার প্রায় শত ভাগে পৌঁছে যেত। আমরা যখন দ্বিতীয় শ্রেণী পাস করে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠেছি তখন হঠাৎ শুনতে পেলাম তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় হাতে প্রশ্ন দিবে, আমাদের তা পড়ে খাতায় উত্তর লিখতে হবে তখন একথা শুনে খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম কি ভাবে লিখব? প্রথম এবং ২য় শ্রেণীতে শিক্ষকগণ প্রশ্ন বুঝিয়ে দিয়েছে বা বোর্ড প্রশ্ন লিখে দিয়েছে আমরা উত্তর লিখেছি। আমার বড় ভাইকে একদিন ঘটনা খুলে বললাম এবং আমার দুচিন্তার কথা জানালাম। আমার বড় ভাই আমাকে বুঝিয়ে বললেন, চিন্তা করনা, শিক্ষকগণ তোমাদের প্রশ্ন বুঝিয়ে দিবে তোমরা উত্তর লিখতে পারবে। তারপর যখন ১ম সামরিক পরীক্ষা দিতে গেলাম, প্রশ্ন হাতে দেয়ার পর আমাদের বাংলার শিক্ষক জনাব, ফজলুল হক (স্যার) সুন্দর করে প্রশ্নটি বুঝিয়ে দিলেন, তখন আমরা সবাই খুশি মনে উত্তর লিখতে পেরেছি। নিজে নিজে খাতায় উত্তর লিখতে পেরে মনে খুব আনন্দ লেগেছিল। তার পর থেকে প্রশ্ন হাতে নিয়ে উত্তর লিখতে কোন অসুবিধা হতো না। এখন শিশু শ্রেণী থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে প্রায় স্কুলেই পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র হাতে দিয়ে দেন এবং শিক্ষার্থীরা পড়ে তা উত্তর খাতায় লেখে।

শিক্ষকগণ প্রশ্ন বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করে কিনা জানি না। ফলে শিক্ষার্থীরা উত্তর লিখতে খুব হিমসিম খায়। কোন, কোন শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে কান্নাকাটি করে পরীক্ষা দিতে পারে না। তবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো শিশু-১ম শ্রেণিতে প্রশ্ন বুঝিয়ে দেয়া এবং উত্তর বোর্ডে লিখে দেয়ার নিয়ম চালু আছে। ২য় শ্রেণীতে শুধু শিক্ষার্থীদের বোর্ডে প্রশ্ন লিখে দেয় এবং বুঝিয়ে দেয় উত্তর শিক্ষার্থীরা লিখে। এভাবে শিশু শ্রেণী থেকে পড়ে যখন শিক্ষার্থীরা ৪র্থ শ্রেণীতে যার তখন তাদের পড়তে এবং লিখতে আর কোন অসুবিধা হয় না। আর যাদের বাড়িতে এবং বাসায় গৃহ শিক্ষক থাকে বড় ভাই বোনের নিকট পড়ার সুযোগ পায় তারা তো খুবই ভালো ছাত্রছাত্রী। প্রাথমিক বিদ্যালয়য়ে তারা খুব ভালো রেজাল্ট করে। আমাদের সময়ে বাড়ির কাজ নেয়া বাধ্যতামূলক ছিল। একে বারে ২য় শ্রেণী থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক দিন একটি ইংরেজি এবং বাংলা হাতের লিখা লিখে নেয়া বাধ্যতামূলক ছিল। শিক্ষক ক্লাসে যাওয়ার আগে শ্রেণী ক্যাপ্টেন স্কুলের খাতাগুলি তুলে টেবিলে রাখতো। শিক্ষক নাম ডাকার পর খাতাগুলি সাইন করে ক্যাপ্টেনের মাধ্যমে সবাইকে দিয়ে দিতো। কেহ হাতের লিখা না আনলে বা বাড়ির কাজ না করলে কঠিন শিক্ষামূলক শাস্তি দেয়া হতো। কোন কারনে যদি একদিন বা দুই দিন স্কুলে যেতে না পারলে তবে ঐ দিন বিকালে বন্ধুদের বাড়ি, বাড়ি ঘুরে আগামী দিনের স্কুলের বাড়ির কাজ কি? কোন বিষয়ে কোন স্যার কি পড়া দিয়েছে তা জেনে পরের দিন শিখে স্কুলে যেতে হতো। কোন কারণে বিদ্যালয়ের হোম ওয়ার্ক না জানতে পারলে পরের দিন সকাল সকাল স্কুলে গিয়ে যে বন্ধু আগে স্কুলে এসেছে তার নিকট থেকে পড়া জেনে ক্লাসের পিছনে বসে পড়া শিখে নিতাম। বাড়ির কাজ না করার জন্য কোন বকুনি বা গালমন্দ যেন শুনতে না হয়। এখন কার ছেলে মেয়েদের পিতামাতা চোখে চোখে রেখে বা হাউজ টিচার রেখে পড়া শেষ করতে হয়।

আমাদের ছেলে মেয়েরা এখন যে সকল সুযোগ-সুবিধা পায় তার চারভাগের একভাগ সুযোগ সুবিধা আমরা পেয়েছি কিনা সন্দেহ আছে। চতুর্থ শ্রেণী পাস করে যখন ৫ম শ্রেণীতে উত্তীণ হয়েছি তখন আমাদের প্রধান শিক্ষক জনাব হাবিবুর রহমান স্যার ক্লাসে এসে বললেন, তোমরা কে কে বৃত্তি পরীক্ষা দিবে। তখন আমরা কেহ ভয়ে কথা বলছি না। তারপর স্যার রোল নং দেখে এবং যার হাতের লেখা সুন্দর পুরো ক্লাস থেকে ২০ জনকে বৃত্তি দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। আমাদের প্রত্যেক দিন আলাদা করে পৃথক ক্লাসের মাধ্যমে বৃত্তি পরীক্ষার জন্য তৈরি করে নিত। আমি ১৯৮১ সালে পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছি। আমাদের সময় বা এর আগে থেকে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ইংরেজি, ধর্ম ছিল না। বাংলা ১০০, অংক ১০০ এবং সমাজ, বিজ্ঞান ১০০ নম্বর সহ মোট ৩০০ নম্বারের পরীক্ষা নেয়া হতো। আমরা ভয় ভীতি এবং শঙ্কামুক্তভাবে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছি এবং বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে পাস করে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছি। এখন যে ভাবে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নেয়া হয় আগে সেভাবে কোন দিন নেয়া হতো না। বর্তমানে দেশের সব চেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা হলো প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। এত অল্প বয়সে কচি, কাঁচা ছেলে মেয়েদের জন্য এত বড় পাবলিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করা শিক্ষামনো বিজ্ঞানের ভাষায় কতটুকু চাপ মুক্ত তা স্পষ্ট নয়। উন্নত দেশে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের জন্য পাবলিক পরীক্ষা আয়োজন করছে কিনা সন্দেহ আছে। আবার কোন, কোন উন্নত দেশে প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষানামক ভীতি জিনিসটি নাই। বিদ্যালয়ের মধ্যেই পড়া লেখা শেষ করে দেয় বাসায় গিয়ে আর পড়তে হয় না এবং শিক্ষার্থীরা বইয়ের বুঝা টানতে হয় না। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে অর্থাৎ সার্ক ভুক্ত দেশগুলিতে প্রাথমিক স্তরে এত বড় পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় কিনা জানি না। আমাদের দেশের পরীক্ষা পদ্ধতি দেখে মনে হয়, শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অভিভাবক উভয়ে আতংকে ভুগছে। তাদের মধ্যে সবর্দা একটা টেনশন বিরাজ করছে। দেশ স্বাধীনের আগে এবং পরে অর্থাৎ ব্রিটিশ আমল থেকে পাক বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত যারা এত বড় পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে ৫ম শ্রেণী পাস করেছে তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আমলা, ব্যারিষ্টার, বিচারক ও জজ হয় নাই। আর যারা আগে আইসিএস, সিএসপি এবং দেশ স্বাধীনের পর বিসিএস পাস করে সরকারি চাকরিতে ঢুকছে তারা কি এখনকার এ+ পাওয়া বা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছেলে মেয়েদের চেয়ে কম জ্ঞানী ছিল। এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা নিজেকে প্রশ্ন করলে অতি সহজে পেয়ে যাই বা বুঝতে পারি। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি প্রাথমিক স্তরে এত বড় পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের টেনশনে রেখে লাভ নাই। আগে যেভাবে বিদ্যালয়ে ভিত্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো এবং শিক্ষার্থীরা যেভাবে হেঁসে খেলে চিন্তাহীন ভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতো সেভাবে হওয়া সমীচীন। আমি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছয় বছর এবং হাইস্কুলে পাঁচ বছর অধ্যয়ন কালে কোন দিন শুনি নাই এবং দেখি নাই আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক মহোদয়গণ শ্রেণীকক্ষের ভিতরে এবং বাইরে অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করেছেন। যা কিছু করেছেন শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানোর জন্য। তাদের কথা, বার্তা চাল চলন ছিল সর্বদা শিক্ষামূলক এবং অনুকরনীয়। স্যারদের আমরা দেখলেই নীরব থেকেছি এবং দৌড়ে গিয়ে ক্লাসে চুপচাপ বসে পড়েছি। এখনকার অনেক শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক তার উল্টোদিক পরিলক্ষিত হয়। আমরা মাঠে কিংবা ক্লাশে গোলমাল করলে আমাদের স্যারগণ রুম থেকে বের হয়ে দরজায় দাড়িয়ে মাঠের দিকে বা ক্লাসের দিকে তাকালেই আমরা হৈচৈ বন্ধ করে দিয়েছি। তাদের তীক্ষ্ণ নজরই আমাদের শাসন করেছিল। এখনকার শিক্ষার্থীরা সেই শাসন পছন্দ করে না। তাদের পিতা, মাতার স্নেহ, মায়া মমতা ভালোবাসা দিয়ে শিক্ষা দিতে হয় এবং প্রয়োজনে বডি ল্যাংগুয়েজ করে শিক্ষাদান কর্মসূচি চালিয়ে যেতে হয়। আগের তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয় অনেক উন্নত হয়েছে।

পাকিস্তান আমলে যখন প্রাথমিক শিক্ষা সরকারি হয় নেই তখন একজন শিক্ষক না কি বেতন পেতেন ৫/- টাকা। তখন এই সল্প বেতন পেয়ে শিক্ষকগণ অনেক পরিশ্রম করে পড়াতেন এবং শহরের চেয়ে গ্রামে তখন মেধাবী শিক্ষার্থী বেশি ছিল। গ্রামের শিক্ষার্থীরা অনেক পরিশ্রম করে পড়তো। এখন কি গ্রামের মেধাবী শিক্ষার্থী কমে গেছে? আগের মতো লেখা পড়া শিখে গ্রামের ছেলেরা নাম করছে দেখতে তো পাচ্ছি না। তারা তো এখন আগের চেয়ে উন্নত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সাবেক অধ্যাপক সেকান্দর আলী ভূইয়া যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এমএ পাস করে তৎকালীন আইসিএস দুর্লভ চাকরিতে যোগ না দিয়ে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন। তিনি তো গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে এত বড় হয়ে ছিলেন। বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা মেজর (অব) এম এ গণি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড. সিরাজুল ইসলাম, দেশ স্বাধীনের পর বাংলাদেশ পুলিশের আইজি আব্দুল খালেক তারা সবাইতো গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং হাই স্কুল থেকে উঠে এসে দেশ ও জাতির অনেক খেদমত করেছিলেন।

এখন তো গ্রামের শিক্ষার্থীরা শহরের শিক্ষার্থীর চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে। আমি যখন স্নাতক শ্রেণীতে পড়ি তখন অধ্যক্ষ ড. সিরাজুল ইসলাম স্যার এর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি গ্রামের কারো সাথে দেখা হলে তার লেখা পড়ার কথা, লন্ডনে পিএইডি করার কথা গল্প করে বলতেন। তিনি আমাদের বলতেন আমি খুব কষ্ট করে অজোপাড়া গাঁয়ে থেকে লেখা পড়া শিখে লন্ডনে পি.এইচ.ডি করেছি। তোমরা পারবে না কেন? আমার পিতাতো কোন চাকরি ব্যবসা করত না। তার এসব কথা শুনে আমরা খুব আগ্রহ পেতাম। পরিশেষ এ কথা বলতে পারি যে, এই বিশ্বায়নের যুগে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষকের মান উন্নত বিশ্বের প্রাথমিক শিক্ষার মতো করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যেন মেধাবী ছাত্রছাত্রী লোখাপড়া করতে আসে এরকম আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে যুগোপযোগী এবং বাস্তবমুখী শিক্ষাদান কর্মসূচি চালিয়ে যেতে হবে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা তখনই সার্থক হবে যখন সেখান থেকে মেধাবী শিক্ষার্থী বের হবে এবং মেধা উৎপন্ন হবে।

[লেখক : শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক]